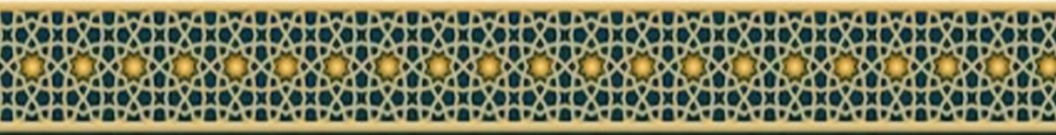


কুরআন-সুন্নাহর আলোকে
হকপন্থী উলামায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য
(১ম খণ্ড)

উস্তায ইবরাহীম হাসান



কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হকপন্থী উলামায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য (১ম খণ্ড)

উস্তায ইবরাহীম হাসান



সুচিপত্র

১. ইখলাস ও লিঙ্কাহিয়াত	৫
২. খাশইয়াতুল্লাহ	৬
৩. ইলম ও আমলের সামঞ্জস্য	৭
৪. আমার বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার	৮
৫. ইনকিতাউ আনিল হুক্কাম: জালেম শাসকের থেকে বিচ্ছিন্নতা	৯
৬. বাতিলের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম: জিহাদ ও কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ	১০
৭. যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতা	১২
৮. ইস্তিকামাত আলাল হক: হকের উপর অবিচলতা	১৩
৯. তাওয়াযু (বিনয়)	১৪
১০. শাফাকাত ও রহমত (মাখলুকের প্রতি দয়া ও মমতা)	১৫
১১. হিকমত ও দূরদর্শিতা (বাসিরাহ)	১৫
১২. সুন্নাত ও নফল আমলের পাবন্দি	১৬

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَغِيثُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَّالَ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْدُ:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না”। (সূরা আলে ইমরান: ১০২)

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে মানবজাতির হেদায়েত ও আত্মিক ইসলামের লক্ষ্যে মহান রবুল আলামীন যুগে যুগে আশিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম-কে প্রেরণ করেছেন। আসমানী নূরের সেই অফুরন্ত ধারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সায়িদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আগমনে পূর্ণতা ও চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। নবুয়তের সেই স্বর্গীয় মশাল এখন আমানত হিসেবে গচ্ছিত হয়েছে এমন এক জামাতের কাছে, যাঁদের ইলম ও আমলের নূর পৃথিবীকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করে। রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মহান উত্তরসূরিদের পরিচয় দিয়ে ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ

“নিশ্চয়ই উলামায়ে কেরাম হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী। আর আশিয়ায়ে কেরাম পার্থিব কোনো ধন-সম্পদ কিংবা দিরহাম-দিনারের মিরাস রেখে যাননি; বরং তাঁরা রেখে গেছেন ইলমে ওহীর মহান উত্তরাধিকার।” (সুনানে আবু দাউদ: ৩৬৪১)

কিন্তু বর্তমানের এই ফিতনা সংকুল সময়ে 'উত্তরাধিকারী'র এই দাবিটি যতটা সম্মানের, তার চেয়ে বেশি কণ্টকাকীর্ণ। ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে যেমন হকের অতন্ত্র প্রহরী 'উলামায়ে রব্বানী'র দেখা মিলেছে, তেমনি ক্ষমতার মোহ আর দুনিয়াবি লালসায় মত্ত 'উলামাউস সু' বা দরবারী আলিমদের অপতৎপরতাও কম ছিল না।

ক্ষমতার মোহ, দুনিয়াবি প্রতিপত্তি আর নফসের গোলামিতে মত্ত একদল যখন দ্বীনের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত, তখন প্রশ্ন জাগে— কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে প্রকৃত হকের অতন্ত্র প্রহরী কারা? কোন গুণাবলি একজন আলিমকে সাধারণ মানুষ থেকে 'নবীদের ওয়ারিশ' হিসেবে আসমা'নে ও জমিনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে? অন্ধকার আর আলোর এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আজ তাই প্রশ্ন জাগে— প্রকৃত হকপন্থী আলিম চেনার কষ্টিপাথর কোনটি?

বিত্রান্তির এই ঘনঘটায় হকপন্থী আলেমদের চিনতে হলে তাঁদের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও আদর্শিক ভিত্তি জানা আবশ্যিক। কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডে একজন আদর্শ ও হকপন্থী আলেমের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও সিফাতসমূহের নিবিড় ব্যবচ্ছেদই আমাদের আজকের এই বিশেষ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

১. ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত

হকপন্থী উলামায়ে কেরামের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের ইলম ও দাওয়াতের মূল চালিকাশক্তি হলো 'ইখলাস' বা নিয়তের বিশুদ্ধতা। একজন রব্বানী আলেমের প্রতিটি কথা, কাজ, ফতোয়া এবং দ্বীনি মেহনত কোনো জাগতিক স্বার্থ, সন্তা জনপ্রিয়তা কিংবা নেতৃত্বের মোহে পরিচালিত হয় না; বরং তাঁর হৃদয়ের গহীন কোণে লুকিয়ে থাকে একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাকুলতা। এই নিয়তের একনিষ্ঠতাই একজন আলেমকে সাধারণ জ্ঞানচর্চাকারী থেকে 'নায়েবে রাসূল' বা নবীর প্রকৃত উত্তরাধিকারীর উচ্চাসনে আসীন করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাছ্ ওয়া তায়ালা মুমিনের জীবনের মূল লক্ষ্য ও দর্শনের সংজ্ঞা দিয়ে ইরশাদ করেন:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“বলুন: আমার সালাত, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ একমাত্র জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।” (সূরা আল-আন'আম: ১৬২)

এই আয়াতের জীবন্ত বিচ্ছুরণ ঘটে হকপন্থী উলামাদের যাপিত জীবনে। যখন কোনো আলেমের অন্তরে 'লিল্লাহিয়াত'— অর্থাৎ সবকিছু কেবল আল্লাহর জন্যই হওয়ার গুণটি বদ্ধমূল হয়, তখন তাঁর ভেতর থেকে জাগতিক ভয় ও লোভের অবসান ঘটে। নিয়ত যখন বিশুদ্ধ হয়, তখন তিনি শাসকের রক্তক্ষু কিংবা নিন্দুকের তীব্র সমালোচনা—কোনো কিছুরই

তোয়াক্কা করেন না। কারণ তাঁর হৃদয়ের কম্পাসটি মাখলুকের সন্তুষ্টির বদলে কেবলই রবের সন্তুষ্টির দিকে মুখ করে থাকে।

হকপন্থী আলেমগণ বিশ্বাস করেন যে, সকল কাজের ক্ষেত্রে যদি তাতে নিয়তের পূর্ণ একনিষ্ঠতা থাকে, তবেই তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য। আর নিয়ত যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে পাহাড়সম ইলম ও আমলও কিয়ামতের দিন ধূলিকণার মতো উড়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

“নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে, যার সে নিয়ত করবে।” (সহীহ বুখারী: ০১)।

প্রকৃত হকপন্থী আলেমের এই যে অটল মানসিক দৃঢ়তা এবং প্রতিকূল পরিবেশেও অকল্পনীয় প্রশান্তি—এটাই হলো নিয়তের একনিষ্ঠতার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। যাঁর ইলমের পেছনে নিয়তের বিশুদ্ধতা নেই, তাঁর দাওয়াত কেবলই বাকচাতুর্য; তা সাময়িকভাবে মানুষকে মুগ্ধ করলেও অন্তরে হিদায়াতের নূর তৈরি করতে পারে না। পক্ষান্তরে যাঁর অন্তরে লিঙ্গাহিয়াত আছে, তাঁর সামান্য কথা ও সাধারণ আমলও আল্লাহর অশেষ রহমতে যুগের পর যুগ মানুষের কলবে হিদায়াতের মশাল হয়ে জ্বলে থাকে। তাঁরা পদ-পদবি বা প্রচারের মোহ ত্যাগ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে কেবল দ্বীনের খেদমত করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

২. খাশইয়াতুল্লাহ

প্রকৃত হকপন্থী আলেম কেবল জ্ঞানের ভাণ্ডার নন, বরং তিনি মহান আল্লাহর ভয়ে সদাটটস্থ এক সত্তা। ইলম বা জ্ঞান অর্জনের মূল উদ্দেশ্যই হলো রবের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে নিজের ক্ষুদ্রতা অনুভব করা। আল-কুরআনের অমোঘ ও চিরন্তন ঘোষণা:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই (উলামাগণ) তাঁকে যথাযথভাবে ভয় করে।”

(সূরা ফাতির: ২৮)

এই আয়াতের সারকথা হলো, যাঁর নিকট আল্লাহর পরিচয় ও ইলম যত বেশি, তাঁর হৃদয়ে আল্লাহর মহত্ত্ব ও ভয় তত বেশি। হকপন্থী উলামায়েকেরাম যখনই কোনো ফতোয়া প্রদান করেন, মিয়াবর বা মঞ্চে কোনো বক্তব্য রাখেন কিংবা নিভূতে কোনো আমল করেন, তখন তাঁদের চিন্তা-চেতনার প্রতিটি রন্ধ্রে এই অনুভূতি জাগ্রত থাকে যে—তাঁরা রবুল আলামীনের

সম্মুখে জবাবদিহি করতে বাধ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খাশইয়াত বা আল্লাহভীতির সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করে ইরশাদ করেছেন—

أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ

“আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানি এবং তোমাদের চেয়ে বেশি তাঁকে ভয় করি।” (সহীহ বুখারী: ৫০৬৩)

এই খাশইয়াতুল্লাহ কেবল কাল্লার নাম নয়, বরং এটি হলো দ্বীনের ওপর অটল থাকা এবং অন্যায়ের সামনে মাথানত না করার আপসহীন শক্তি। হকপন্থী আলেমের চেহারায এক ধরনের স্বর্গীয় প্রশান্তি ও গাভীর্য বিরাজ করে, যা কেবল গভীর আল্লাহভীতি থেকেই অর্জিত হয়। এই আল্লাহভীতির কারণেই তাঁরা দুনিয়াবি কোনো শক্তি বা শাসকের রক্তচক্ষুকে ভয় পান না।

তাঁদের ইলম তাঁদেরকে উদ্ধত করে না, বরং বিনয়ী করে তোলে। তাঁরা ইলমকে দুনিয়া কামানোর হাতিয়ার বানান না, বরং একে আখেরাতের নাজাতের উসিলা হিসেবে গ্রহণ করেন। যে আলিমের হৃদয়ে খাশইয়াত বা ভয় নেই, তাঁর ইলম কেবলই মস্তিষ্কজাত মরীচিকা; পক্ষান্তরে হকপন্থী আলিমের ইলম হলো অন্তরের আলো, যা তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতিটি পদক্ষেপে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করে।

৩. ইলম ও আমলের সামঞ্জস্য

যাঁর কথা ও কাজের মধ্যে দুষ্টর ব্যবধান থাকে, তিনি কখনোই হকের দিশারি হতে পারেন না। হকপন্থী উলামায়ে কেরামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—তাঁদের ইলম ও আমলের অভিন্নতা। তাঁরা কেবল জ্ঞানের বাহক নন, বরং সেই জ্ঞানের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তাঁরা মানুষকে যা আদেশ করেন, তা নিজের জীবনে সবার আগে বাস্তবায়ন করেন এবং যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে নিজেরা সবার আগে দূরে থাকেন।

পরিগ্রহ কুরআনে সেই সব ব্যক্তিদের কঠোর তিরস্কার করা হয়েছে, যাঁদের কথার সাথে কাজের মিল নেই। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত করো; তবে কি তোমরা বুঝো না?” (সূরা আল-বাকারাহ: ৪৪)

হকপন্থী আলেমগণ বিশ্বাস করেন যে, আমলহীন ইলম হলো ফলহীন বৃক্ষের মতো, যা কারো উপকারে আসে না। ইমামুল আযম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ-এর জীবনের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। বর্ণিত আছে যে, একবার এক ক্রীতদাস তাঁর কাছে এসে দাসের মুক্তি ও ক্রীতদাস প্রথার ওপর আলোচনা করতে অনুরোধ করেন। ইমাম সাহেব সাথে সাথে আলোচনা না করে দীর্ঘ দুই মাস সময় নিলেন। পরবর্তীতে জানা গেল, তাঁর নিজের কোনো দাস ছিল না। তিনি আগে নিজ অর্থ দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে তাকে মুক্ত করে দিলেন, অতঃপর সেই বিষয়ে আলোচনা করলেন।

একেই বলে ইলম ও আমলের পূর্ণাঙ্গ সমন্বয়। একজন প্রকৃত আলেমের চাল-চলন, ইবাদত এবং মুয়ামলাত বা লেনদেনে তাঁর অর্জিত ইলমের প্রতিফলন ঘটে। তিনি যখন তাকওয়ার কথা বলেন, তখন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত থাকে; তিনি যখন ত্যাগের কথা বলেন, তখন তিনি নিজেই ত্যাগের অগ্রসেনানী হন। এই সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তাই সাধারণ মানুষের হৃদয়ে তাঁদের প্রতি গভীর আস্থা ও ভালোবাসা তৈরি করে। যাঁর ইলম ও আমল একসূত্রে গাঁথা, তাঁর দাওয়াতই সমাজ সংস্কারে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৪. আমার বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার

একজন হকপন্থী আলেমের অস্তিত্বই যেন সমাজ সংস্কারের এক চলমান ইশতেহার। যখন চারপাশের পরিবেশ পাপাচারের কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, হকের সূর্য কালো মেঘে ঢাকা পড়ে যায়, আর মানুষ গাফলতির চাদর মুড়িয়ে অন্যায়ের সাথে আপস করতে শেখে— তখন তিনি নিছক নীরব দর্শক হয়ে থাকেন না। তসবিহ হাতে কোণে বসে থাকা তাঁর কাজ নয়; বরং তাঁর অন্তরে উম্মাহর জন্য যে অদম্য দরদ জাগ্রত থাকে, সেটিই তাঁকে অস্থির করে তোলে, জাগিয়ে তোলে দায়িত্ববোধে।

এই দায়িত্বের পরিচয় কেবল ব্যক্তিগত উপলব্ধি নয়; বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষিত এক মহান মর্যাদা ও দায়িত্ব।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত... তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো।” (সূরা আল-ইমরান: ১১০)

তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন—মন্দকে কেবল অন্তরে ঘৃণা করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না; বরং সেই মন্দকে প্রতিরোধ করার মধ্যেই ঈমানের প্রকৃত প্রকাশ নিহিত। তাই তাঁর দাওয়াত

কেবল তাত্ত্বিক বয়ানে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা রূপ নেয় জীবন্ত আস্থানে। কখনো তিনি পিতার স্নেহে মানুষকে টেনে নেন, কখনো শিক্ষকের যুক্তিতে বোঝান, আবার কখনো অভিভাবকের দৃঢ়তায় সতর্ক করে দেন—কিন্তু তাঁর লক্ষ্য একটিই: মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনা।

তাঁর এই অবস্থান কোনো পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফসল নয়; বরং এটি উৎসারিত হয় এক গভীর ঈমানী চেতনা থেকে—আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে। তিনি বিশ্বাস করেন, যে সমাজে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়, সে সমাজ ধীরে ধীরে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং অবধারিতভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

এই উপলব্ধিই তাঁকে তড়িত করে—নিজের আরাম-আয়েশ, ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও নীরব জীবনের আকর্ষণ ত্যাগ করে তিনি নেমে পড়েন মানুষের মাঝে। সমাজের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি পরতে তিনি পৌঁছে দিতে চান হকের বাণী—যেন নিভে হিদায়াত হারিয়ে ফেলা মানুষগুলো আবার জ্বলে ওঠে ঈমানী শক্তিতে।

৫. ইনকিতাউ আনিল হুক্কাম: জালেম শাসকের থেকে বিচ্ছিন্নতা

ইতিহাস বারবার সাক্ষ্য দিয়েছে—যখন কোনো আলেম রাজদরবারের মোসাহেবিতে নিজেকে সাঁপে দিয়েছেন, তখন ধীরে ধীরে তাঁর কলমের ধার ভোঁতা হয়ে এসেছে, কণ্ঠের তেজ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। ক্ষমতার নৈকট্য প্রথমে সম্মান মনে হলেও, সময়ের সাথে তা হয়ে ওঠে এক সূক্ষ্ম বন্ধন—যা হক উচ্চারণের সাহসকে অদৃশ্যভাবে গ্রাস করে ফেলে। হকপন্থী আলেম এই মায়াজাল ও লুকায়িত ফিতনার ব্যাপারে গভীরভাবে সজাগ।

এই উপলব্ধি তাঁর অন্তরে এক সুস্পষ্ট মানদণ্ড তৈরি করে—হকের মর্যাদা কখনো ক্ষমতার সান্নিধ্যের বিনিময়ে ক্ষুণ্ণ হতে পারে না।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত... তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো।” (সূরা আল-ইমরান: ১১০)

তিনি জানেন—শাসকের দস্তরখান, রাজকীয় উপটোকন কিংবা বাহ্যিক সম্মান অনেক সময় এমন এক অদৃশ্য ঋণ তৈরি করে, যা পরবর্তীতে সত্য বলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তিনি সেই বন্ধনে নিজেকে জড়ান না। তিনি শাসকদের শত্রু নন; বরং সত্যের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতাই তাঁকে একটি সংযত, মর্যাদাপূর্ণ দূরত্ব বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

এই দূরত্ব কোনো অহংকার নয়, কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদও নয়; বরং এটি তাঁর ইলমের পবিত্রতা ও ফতোয়ার নিরপেক্ষতা রক্ষার এক সচেতন অবস্থান। তাঁর কাছে রাজপ্রাসাদের বিলাসিতার চেয়ে সাদামাটা জীবন অনেক বেশি সম্মানজনক—কারণ এই হালাতে তিনি অবাধে, নির্ভয়ে হকের কথা উচ্চারণ করতে পারেন।

তিনি নিজেকে কোনো দল, গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক স্বার্থের অনুগত করে তোলেন না। তাঁর আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিবেদিত। আর ঠিক এই স্বাধীনতাই তাঁকে সেই সাহস দান করে, যার মাধ্যমে তিনি প্রয়োজনবোধে শাসকের ভুল ধরিয়ে দিতে পারেন—কোনো ভীতি বা স্বার্থের হিসাব ছাড়াই।

এই নির্লিপ্ততা, এই আত্মমর্যাদাবোধই তাঁকে উম্মাহর কাছে করে তোলে নির্ভরযোগ্য, শ্রদ্ধেয় এবং সত্যের এক অটল প্রতীক।

৬. বাতিলের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম: জিহাদ ও কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ

হকপন্থী রক্বানী আলেমগণের সংগ্রাম কেবল তাত্ত্বিক কোনো আলোচনা নয়, বরং এটি দ্বীনকে বিজয়ী করার এক অবিরাম জিহাদ। এই জিহাদ ক্ষণিকের আবেগ নয়; বরং ঈমানি চেতনার অবিনাশী আলোকবর্তিকা—এক দীর্ঘ, ধৈর্যশীল এবং সচেতন রণাঙ্গন। যখন ইসলামি মূল্যবোধে আঘাত আসে, যখন উম্মাহর আকিদাহ ও তাওহীদি বিশ্বাসে কুফরের বিষবাস্প ছড়ানোর ধৃষ্টতা দেখানো হয়, তখন একজন প্রকৃত আলেম কেবল জায়নামাজে বসে চোখের পানি ফেলে দায়িত্ব শেষ করেন না। বরং কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকচ্ছটায় তিনি ময়দানে অবতীর্ণ হন—এক দুঃসাহসী সিপাহসালার ও প্রখর প্রহরীর ভূমিকায়।

এই মহান সংগ্রাম সর্বদা কেবল কলম বা জবানে সীমাবদ্ধ নয়। যখন বাতিলের আফালন সীমা অতিক্রম করে এবং ফিতনা যখন দ্বীনকে মিটিয়ে দেওয়ার উপক্রমে পৌঁছায়, তখন 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' তার পূর্ণ শক্তিতে আবির্ভূত হয়। হকের পতাকাবাহীগণ জানেন যে, বাতিল কেবল যুক্তিতে দমে না; অনেক সময় তাকে দমনের জন্য কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ'র প্রয়োজন হয়।

যখন কুফরি শক্তি সশস্ত্র পন্থায় ইসলামের পথ রুদ্ধ করে, তখন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে সশরীরে কিতালে (সশস্ত্র লড়াই) অবতীর্ণ হওয়া মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই (কিতাল) কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে ষালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই।” (সূরা আল-বাকারাহ ২:১৯৩)

তিনি আধুনিকতার মোড়কে আসা দাজ্জালি ফিতনা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার থাকেন, তেমনি দ্বীনের প্রয়োজনে বাতিলের টুটি চেপে ধরতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। তাঁর কাছে আপস মানেই হলো পরাজয়, আর শাহাদাত মানেই হলো চিরন্তন বিজয়।

নির্ভীক অবস্থান ও ইমানি শক্তি

প্রচণ্ড বৈরী শক্তির মুখোমুখি হয়েও একজন হকপন্থী আলেম বিচলিত হন না। সংখ্যা বা সরঞ্জামের স্বল্পতা তাঁকে হীনম্মন্যতায় ভোগায় না; কারণ তাঁর নির্ভরতা নশ্বর মানুষের সমর্থনের ওপর নয়, বরং আরশের অধিপতি মহান রবের সীমাহীন রহমতের ওপর। তাঁর দৃষ্টিতে বাতিল হলো খরস্রোতা নদীর উপরের আবর্জনার মতো—দেখতে আশ্ফালনকারী মনে হলেও সত্যের একটি আঘাতেই তা বিলীন হয়ে যায়।

তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, বাতিলকে তুষ্ট করে দ্বীন পালন সম্ভব নয়। তাই কোনো রক্তচক্ষু, পার্থিব প্রলোভন বা কারাকোষ্ঠের অন্ধকার তাঁকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। তিনি উম্মাহকে শিক্ষা দেন যে, আরাম-আয়েশ মুমিনের লক্ষ্য নয়, বরং দ্বীনের সম্মানে রক্ত ও ঘাম বরানোই হলো প্রকৃত কামিয়াবি।

নববী আদর্শ ও জিহাদের মূল চেতনা

এই সংগ্রামের মূল চালিকাশক্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা। তিনি সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সেই বিপ্লবী আদর্শকে বুকো ধারণ করেন, যেখানে বাতিলের সাথে কোনো মৈত্রীর স্থান নেই। আল্লাহ সুবহানা হু ওয়া তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

“হে নবী! আপনি কাকের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।” (সূরা আত-তাওবাহ: ৭৩)

বাতিল যখন ক্ষমতার মসনদে বসে জুলুমের রাজত্ব কায়েম করে, তখন সেই জঘন্য শক্তির মুখে সত্য উচ্চারণ করাকেই তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ তামান্না মনে করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলাই হলো সর্বোত্তম জিহাদ।”

(সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৪৪)

সুতরাং, হকপন্থী আলেমের এই পথচলা কেবল ব্যক্তিগত সংশোধনের নয়, বরং সামগ্রিক জীবনব্যবস্থায় ইসলামকে বিজয়ী করার এবং কুফর ও শিরকের মূলোৎপাটন করার এক নিরবচ্ছিন্ন জিহাদ। এই জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

৭. যুহুদ ও দুনিয়াবিমুখতা

দুনিয়ার চাকচিক্য যখন মানুষের দৃষ্টিকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে, যখন প্রাপ্তির নেশা বিবেককে আচ্ছন্ন করে দেয়—তখন হকপন্থী আলেম বেছে নেন এক ভিন্ন পথ। তাঁর জীবন বাহ্যিকভাবে সাধারণ, কিন্তু অন্তরে তা গভীর এক স্বাধীনতার প্রকাশ। তিনি দুনিয়াকে ত্যাগ করেন না; বরং দুনিয়ার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন—এটাই তাঁর যুহুদ।

যুহুদ মানে দরিদ্রকে আঁকড়ে ধরা নয়, কিংবা কৃত্রিমভাবে নিজেকে কষ্টে রাখা নয়; বরং এর প্রকৃত অর্থ হলো—দুনিয়ার মোহ যেন হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিতে না পারে। তাঁর হাতে দুনিয়া থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর হৃদয় থাকে আখিরাতমুখী। এ এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য, যা কেবল গভীর ঈমান ও আত্মসংযমের মাধ্যমেই অর্জন সম্ভব।

তাঁর চিন্তা, শ্রম ও পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সাফল্য নয়; বরং আখিরাতের স্থায়ী সফলতা। তিনি এই জীবনকে দেখেন এক মুসাফিরখানা হিসেবে—যেখানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে যাত্রা অনিবার্য। তাই দামী বাড়ি, গাড়ি বা সঞ্চয়ের প্রাচুর্য তাঁর আকাঙ্ক্ষার বিষয় নয়; বরং তাঁর আসল লক্ষ্য—কত বেশি মানুষকে আল্লাহর সাথে পরিচিত করানো যায়, কতগুলো অন্তরকে হেদায়েতের আলোয় আলোকিত করা যায়।

ভোগবাদী সমাজে, যেখানে প্রতিনিয়ত “আরও চাই” মানসিকতা মানুষকে অস্থির করে তোলে, সেখানে তিনি ‘কানাআত’—অল্পে তুষ্ট থাকার এক গভীর প্রশান্তি খুঁজে পান। এই তুষ্টিই তাঁকে করে তোলে অন্তরসমৃদ্ধ, নির্ভর এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসাশীল। তাঁর এই নির্লোভ, নিরাসক্ত চরিত্রই তাঁকে মানুষের চোখে এক ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যায়—যেখানে সম্মান আসে সম্পদ থেকে নয়, বরং চরিত্রের দীপ্তি থেকে।

এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল শিক্ষা হিসেবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বাণীকে হৃদয়ে ধারণ করেন—

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

“দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন মুসাফির অথবা পথচারী।”

(সহীহ বুখারী: ৬৪১৬)

৮. ইস্তিকামাত আলাল হক: হকের উপর অবিচলতা

হকের পথ কখনোই আরাম-আয়েশের বিছানো পথ নয়; এটি বরং এক দীর্ঘ, কষ্টকাকীর্ণ মরণভূমি—যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপেই থাকে পরীক্ষা, প্রতিটি অগ্রযাত্রায় থাকে কুরবানী। হকপন্থী আলেম সেই কঠিন পথেই নিজের জীবনকে সমর্পণ করেন। তাঁর সামনে কখনো লাঞ্ছনার ভয়, কখনো অপপ্রচারের তীর, আবার কখনো কারাবাসের অন্ধকার—তবুও তাঁর পদচারণা থেমে যায় না।

কারণ তাঁর কাছে হক কোনো পরিস্থিতির অধীন নয়; বরং হক'ই তাঁর জীবনের ভিত্তি। তাই প্রতিকূলতা তাঁকে দুর্বল করে না, বরং আরও দৃঢ় করে তোলে। চাপ আসে চারদিক থেকে, ভুল বুঝাবুঝি ঘনীভূত হয়, এমনকি আপনজনদের দূরত্বও কখনো কখনো তাঁকে স্পর্শ করে—তবুও তিনি নিজের অবস্থান থেকে এক চুলও সরে দাঁড়ান না। তিনি পাহাড়ের মতো স্থির থাকেন, যার বিরুদ্ধে ঝড় আছড়ে পড়লেও তার অবস্থান অটুট থাকে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন—

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

“অতএব, আপনি অটল থাকুন যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন।” (সূরা হুদ: ১১২)

তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন—হকের পথে টিকে থাকা মানে আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পথে থাকা। আর যে হকের উপর অটল অবিচল থাকে, রাব্বের কারীম তাকে কেবল সম্মানই দেন না, বরং এক অনন্ত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিও দেন।

তাঁর অন্তরে সর্বদা এই দৃঢ় বিশ্বাস জাগ্রত থাকে যে, প্রকৃত সাহায্য আসে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। মানুষের হুমকি, রক্তচক্ষু কিংবা দুনিয়াবি প্রলোভন তাঁর ঈমানি দৃঢ়তার সামনে তুচ্ছ হয়ে যায়

এই ইস্তিকামাতই তাঁকে কেবল একজন আলেম নয়, বরং এক জীবন্ত দৃষ্টান্তে পরিণত করে। তাঁকে দেখে ভগ্ন হৃদয়ের মানুষ আবার সাহস খুঁজে পায়, হতাশ উন্মাহ নতুন করে আশার আলো দেখতে শেখে।

৯. তাওয়াযু (বিনয়)

ইলম মানুষকে উঁচু করে, কিন্তু প্রকৃত ইলম অহংকার নয়—বরং বিনয়ের গভীরতায় হৃদয়কে নত করে দেয়। হকপন্থী আলেমের চরিত্রে এই সত্যটি জীবন্তভাবে প্রকাশ পায়। জ্ঞানের বিস্তৃতি যত বাড়ে, তাঁর অন্তরের নম্রতাও তত গভীর হয়। তিনি যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন, মানুষের সাথে তাঁর আচরণ থাকে স্বাভাবিক, কোমল এবং হৃদয়গ্রাহী।

তিনি নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবেন না; বরং নিজের ভেতরের অপূর্ণতা ও ত্রুটির ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকেন। এই আত্মসমালোচনাই তাঁকে প্রতিনিয়ত শুদ্ধ হতে সাহায্য করে, আল্লাহর নিকট আরও নত হতে শেখায়।

সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর আচরণে কোনো কৃত্রিম দূরত্ব থাকে না। তাঁর দরজা সবার জন্য খোলা থাকে। অভিজাত কিংবা সাধারণ, জ্ঞানী কিংবা শিক্ষানবিশ—সবাই তাঁর কাছে সমান স্নেহ ও গুরুত্ব পায়। বড়দের প্রতি সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাহকে জীবন্তভাবে ধারণ করেন।

তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন—অহংকার এমন এক অন্তর্গত ব্যাধি, যা অণু পরিমাণ হলেও মানুষের আখিরাতকে ধ্বংস করতে পারে। তাই খ্যাতি, প্রশংসা কিংবা নেতৃত্বের আকর্ষণ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। তাঁর হৃদয় এসবের ঊর্ধ্বে—আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।” (সহীহ মুসলিম: ২৫৮৮)

এই আকাশসম জ্ঞানের সাথে মাটির মতো বিনয়ের সংমিশ্রণই তাঁকে প্রকৃত ‘রাব্বানী আলেম’-এর মর্যাদায় উন্নীত করে—যাঁর জ্ঞান মানুষকে কাছে টানে, আর তাঁর বিনয় মানুষকে হৃদয়ের গভীরে স্থান করে দেয়।

১০. শাফাকাত ও রহমত (মাখলুকের প্রতি দয়া ও মমতা)

হকপন্থী আলেম বাতিলের মোকাবেলায় যতটা দৃঢ় ও কঠোর, মুসলিমদের বেলায় তাঁর অন্তর ততটাই কোমল ও করুণায় ভরা।

তাঁর হৃদয়ে প্রতিটি পথভ্রষ্ট মানুষের জন্য এক নিঃশব্দ হাহাকার লুকিয়ে থাকে। তিনি যখন সত্য উচ্চারণ করেন, তখন সেই কথার মধ্যে দৃঢ়তা থাকে বটে, কিন্তু তার গভীরে লুকিয়ে থাকে এক বিশাল মমতা—উম্মাহকে জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার আকুতি।

মানুষের ভুলত্রুটি তাঁর কাছে উপহাসের বিষয় নয়। তিনি কাউকে হেয় করেন না, বরং নির্জনে, নিঃশব্দে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করেন—এমনভাবে, যাতে তার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে এবং হৃদয় নরম হয়। তাঁর উপদেশে কঠোরতা থাকলেও তাতে থাকে পিতৃসুলভ ভালোবাসার উষ্ণতা।

তিনি বিশ্বাস করেন—প্রতিটি মানুষই আল্লাহর বান্দা, আর কোনো বান্দাই চূড়ান্তভাবে হারিয়ে যায় না যতক্ষণ না সে নিজেই ফিরে আসার দরজা বন্ধ করে দেয়। এই বিশ্বাস তাঁকে সারারাত রবের দরবারে অশ্রুসিক্ত করে তোলে, উম্মাহর হেদায়েতের জন্য তাঁর দোয়া অবিরাম প্রবাহিত হয়।

রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

بِالْمُؤْمِنِينَ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ

“মুমিনদের প্রতি তিনি পরম স্নেহশীল ও দয়ালু।” (সূরা তাওবা: ১২৮)

চরম পাপাচারে নিমজ্জিত কেউ যখন তাঁর সামনে আসে, তিনি তাকে নিরাশ করেন না। বরং তার ভাঙা হৃদয়ে আশা জাগান—তওবার দরজা এখনো খোলা, ফিরে আসার পথ এখনো অব্যাহত। এই আশার বাণীই তাঁর দাওয়াতকে জীবন্ত করে তোলে, আর তাঁর শাফাকাত মানুষের কঠিন হৃদয়কেও কোমল করে দেয়, যেন বরফে জমে থাকা ভূমিতে হঠাৎ বসন্ত নেমে আসে।

১১. হিকমত ও দূরদর্শিতা (বাসিরাহ)

হকপন্থী আলেম কেবল কিতাবের পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ নন; তাঁর দৃষ্টি সময়ের গভীরে প্রবেশ করে, তাঁর উপলব্ধি ঘটনাপ্রবাহের বাহ্যিক রূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বাস্তবতাকে স্পর্শ করে। তাঁর মধ্যে যে ‘বাসিরাহ’ বা অন্তর্দৃষ্টির আলো বিদ্যমান, তা কেবল জ্ঞান নয়—বরং জ্ঞানের

ভেতর থেকে জন্ম নেওয়া এক গভীর প্রজ্ঞা, যার মাধ্যমে তিনি হক কে তার নিঃশব্দ রূপেও চিনতে পারেন।

এই আলোয় তিনি ঘটনাকে শুধু ঘটে যাওয়া হিসেবে দেখেন না; বরং তার পেছনের উদ্দেশ্য, প্রভাব ও পরিণতির গভীর স্তরগুলোও অনুধাবন করেন। ফলে সময়ের বিভ্রান্তি, সমাজের জটিলতা কিংবা রাজনৈতিক সূক্ষ্ম চাল—কোনোটিই তাঁকে সহজে দিশেহারা করতে পারে না।

তিনি জানেন, কথা কখন বলতে হয় আর নীরবতা কখন অধিক প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তাঁর বক্তব্যে তাড়াহুড়া নেই, আবার নীরবতায়ও গাফিলতি নেই। প্রতিটি পদক্ষেপই হয় পরিমিত, পরিশীলিত এবং প্রাসঙ্গিক।

আধুনিক যুগের ফিতনা যখন রঙ বদলে সামনে আসে—কখনো জ্ঞানের আবরণে, কখনো সংস্কৃতির নামে, কখনো স্বাধীনতার স্লোগানে—তখন তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় তা চিনতে সক্ষম হন। আর সেই চেনা থেকেই তিনি উম্মাহকে সতর্ক করেন, দিকনির্দেশনা দেন এবং বিভ্রান্তির পথ থেকে ফিরিয়ে আনেন।

কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করেন না। বরং শরিয়তের বৃহত্তর উদ্দেশ্য (مقاصد الشريعة) এবং মানবকল্যাণ (مصلحة) তাঁর বিবেচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। ফলে তাঁর প্রতিটি মতামত হয়ে ওঠে গভীর গবেষণা, ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা এবং দূরদর্শী প্রজ্ঞার সমন্বয়।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা বলেন—

أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ

“আমি জাগ্রত অন্তর্দৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে ডাকি।” (সূরা ইউসুফ: ১০৮)

এই হিকমতই তাঁকে কেবল একজন বক্তা বা শিক্ষক নয়—বরং উম্মাহর জন্য এক নিরাপদ দিকনির্দেশক আলোকবর্তিকায় পরিণত করে, যার আলো বিপদের অন্ধকারে পথ হারানো মানুষকে আবার সঠিক গন্তব্যের দিকে ফিরিয়ে আনে।

১২. সূরাত ও নফল আমলের পাবন্দি

হকপন্থী আলেমের দিনের দীপ্তি কোনো আকস্মিক শক্তির ফল নয়; তার উৎস লুকিয়ে থাকে রাতের গভীর নিস্তব্ধতায়—যেখানে পৃথিবী ঘুমিয়ে থাকে, আর তিনি জেগে থাকেন তাঁর রবের সামনে। দিনের বেলার তাঁর দৃঢ় কণ্ঠস্বর, সাহসী অবস্থান এবং প্রভাবশালী আহ্বানের পেছনে থাকে সেই নিভৃত রাতের অশ্রু, সিজদা এবং আত্মসমর্পণের ইতিহাস।

কিয়ামুদ্বাইল

রাতের বেলায় তিনি নিজের দীনতা ও আল্লাহর প্রতি অমুখাপেক্ষিতার গভীর স্বীকৃতি প্রকাশ করেন। এই রাতের সম্পর্কই তাঁকে দিনের আলোয় বাতিলের সামনে পাহাড়ের মতো অটল রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

“তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা থাকে; তারা তাদের রবকে ডাকেন ভয় ও আশা নিয়ে।” (সূরা আস-সাজদাহ: ১৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেছেন:

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ، وَمَهْدَاهُ لِلْإِثْمِ

“তোমরা রাতের কিয়াম (তাহাজ্জুদ) আঁকড়ে ধরো, কারণ এটি তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার বান্দাদের অভ্যাস, তোমাদের রবের নৈকট্য লাভের মাধ্যম, গুনাহ মোচনকারী এবং পাপ থেকে রক্ষাকবচ।” (তিরমিজি: ৩৫৪৯)

নফল সিয়াম:

একজন হকপন্থী আলেম কেবল উদরপূর্তিতে মগ্ন থাকেন না, বরং তিনি সুন্নাহ অনুযায়ী সিয়াম পালনে সচেতন থাকেন। এই সিয়াম তাঁর আত্মাকে কলুষমুক্ত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

“আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি একদিন রোজা রাখে, আল্লাহ তার থেকে জাহান্নামকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেন।” (বুখারি: ২৮৪০)

জিকির ও মাসনুন দোয়ার আমল

তাসবিহ, তাহলিল এবং সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন দোয়াগুলো তাঁর চারপাশে এক অদৃশ্য সুরক্ষা প্রাচীর তৈরি করে। তাঁর জিহ্বা সর্বদা রবের জিকিরে সিক্ত থাকে।

কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“জেনে রেখো, আল্লাহর জিকিরেই কেবল অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।” (সূরা আর-রাদ: ২৮)

নফল ইবাদতের মাধ্যমে খোদাভীতি ও নৈকট্য

তিনি ফরজের পাশাপাশি নফল ইবাদতে এই জন্য মনোযোগী হন যে, এটিই আল্লাহর ‘মাহবুব’ বা প্রিয় হওয়ার একমাত্র পথ। হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنُّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

“বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার কাছে আসতেই থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি।” (বুখারি: ৬৫০২)

রাক্বের কারীমের সাথে তাঁর এই সম্পর্কই তাঁকে বাহ্যিক জাঁকজমক থেকে দূরে রাখে এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে করে তোলে নূর ও বরকতে পরিপূর্ণ। যখন তিনি আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ককে গভীর করেন, আল্লাহও তাঁর প্রতি মানুষের হৃদয়ে মহব্বত ও শ্রদ্ধা ঢেলে দেন। তাঁর প্রশান্ত দৃঢ়তা ও নিঃস্বার্থ আলোই পথহারা উম্মাহকে দেখায় জান্নাতের সঠিক দিশা।